লেখক পরিচিতি

নাসেরুদ্দীন আলবানী (রঃ) বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মোহাদ্দেস বা হাদীস বিশারদ। আরব ও মুসলিম বিশ্বে তিনি হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ও রেফারেন্স ব্যক্তি হিসেবে গণ্য। বিশ্বে হাদীস গ্রন্থের সংখ্যা অসংখ্য। তিনি বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ থেকে বিশুদ্ধ হাদীসগুলোকে দুর্বল ও জাল হাদীস পৃথক করেছেন। তিনি সহীহ হাদীসগুলোকে বাছাই করে سِلْسِلَةُ الْاَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةُ এবং দুর্বল হাদীসগুলোকে سِلْسِلَةُ الْاَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةُ নামক দু'টো পৃথক সংকলনে প্রকাশ করেছেন। এজন্য তাঁকে 'বাদশাহ ফয়সাল' আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। আরব বিশ্বের ওলামায়ে কেরাম কোন হাদীসকে গ্রহণ ও বর্জনের জন্য আলবানীর মতামতকে মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন।**

তিনি সহীহ হাদীসসমূহের আলোকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায পদ্ধতি তুলে ধরার তীব্র প্রয়োজন অনুভব করেন। আর এটা তাঁর মত একজন অনন্য সাধারণ ও প্রথিতযশা পণ্ডিতের পক্ষেই সম্ভব। এ বিষয়ের উপর তিনি ছাড়া আর কোন আলেম এককভাবে কোন বই রচনা করেননি। তিনি এ বইটিতে হাদীস গ্রহণের প্রতি চার মাজহাবের অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরার লক্ষ্যে এক মহামূলবান ভূমিকা লেখায় বইটি পরশ পাথরের মূল্যকেও ছাড়িয়ে গেছে। এ অনন্য ভূমিকাটি বইটিকে অসাধারণ ও বিশ্বজনীন করেছে এবং সকল মত ও মাজহাবের লোকের নিকট সমানভাবে সমাদৃত করেছে।

লেখকের পিতার নাম নূহ আলবানী। তিনি ১৩৩৩ হিঃ সালে আলবেনিয়ার প্রচীন রাজধানী আশকুদারার এক গরীব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আলবেনিয়ার বাদশা আহমদ যোগো দেশে ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা চালু করার কারণে পিতা নূহ নিজেই ঈমান ও জান-মালের নিরাপত্তাহীনতার আশংকায় সিরিয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত করে দামেশক পৌঁছেন।

নাসেরুদ্দীন আলবানী প্রথমে পিতার কাছে আরবী ভাষা ও কোরআনসহ হানাফী মাজহাবের ফেকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি কোরআন-হাদীস, ফিকাহ-আকীদাসহ ইসলামী এলেমে ব্যুৎপুত্তি অর্জন করেন। এরপর এলেম ও দ্বীনের দাওয়াতী কাজে মনোনিবেশ করেন। দ্বীনের দাওয়াত ও সংগ্রামে তাঁকে দু'বার কারাবরণ করতে হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২-এর অধিক।

তিনি ১৩৮১-১৩৮৩ হিঃ পর্যন্ত মদীনার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মোহাদ্দেস হিসেবে হাদীস শিক্ষা দেন এবং ১৩৯৮ হিঃ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি দামেস্ক এবং পরে জর্দানে বাস করেন। ১৯৯৯ সন মোতাবেক ১৪২১ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাঁকে এ বিশাল দ্বীনি খেদমতের জন্য জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

** এছাড়াও তিনি নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী এবং আবু দাউদের সহীহ ও দুর্বল হাদীসগুলোর পৃথক পৃথক সংকলন করেন।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম ভাগ	
১. অনুবাদকের কথা	৭
২. লেখক পরিচিতি	৮
৩. ভূমিকা	১৫
* বইটি লেখার কারণ	১৮
* বইতে অনুসৃত পদ্ধতি	২০
* হাদীস অনুসরণের বিষয়ে ইমামদের মতামত ও তাদের হাদীস বিরোধী বক্তব্য প্রত্যাখ্যান	২২
১. ইমাম আবু হানীফা (রঃ)	২২
২. মালেক বিন আনাস (রঃ)	২৪
৩. ইমাম শাফেঈ (রঃ)	২৫
৪. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল	২৭
* ইমামদের হাদীস বিরোধী বক্তব্যে ছাত্রদের ভূমিকা	৩০
* একটি সন্দেহের জওয়াব	৩২
৪. রসূলুল্লা (সঃ)-এর নামায পদ্ধতি	৪৩
* কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো	৪৫
* কেয়াম (দাঁড়ানো)	৪৭
* অসুস্থ লোকের বসে নামায পড়া	৪৮
* নৌকায় নামায	৪৮
* রাত্রের নামাযে দাঁড়ানো ও বসা	৪৯
* জুতা সহকারে নামায পড়া ও অনুরূপ করার আদেশ	৪৯
* মিম্বরের উপর নামায আদায়	৫০
* সুতরাহ (আড়াল) ও এর অপরিহার্যতা	৫০
* সুতরাহ না থাকলে যে জিনিস নামায ভঙ্গ করে	৫৩
* কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া	৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
* নিয়্যত	৫৩
* তাকবীর	৫৩
* দু'হাত তোলা (রফে' ইয়াদাইন)	৫৪
* বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা	৫৪
* বুকে হাত রাখা	৫৫
* সাজদার স্থানের প্রতি নযর রাখা ও বিনয়ী হওয়া	৫৫
* নামায শুরুর দোআ	৫৭
* সূরা-কেরাআত পাঠ	৬৩
* সূরা ফাতেহা নামাযের রোকন হওয়া এবং এর ফযীলত	৬৪
* ইমামের প্রকাশ্য কেরাআতে মুকতাদি কেরাআত পড়বে না	৬৫
* ইমামের অপ্রকাশ্য কেরাআতে মুকতাদী কেরাআত পড়বে	৬৬
* আমীন বলা এবং ইমামের প্রকাশ্যে আমীন বলা	৬৭
* সূরা ফাতেহার পর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কেরাআত	৬৮
* একই রাকআতে একই ধরনের সূরা কিংবা ভিন্ন ধরনের সূরা পড়া	৭০
* শুধু সূরা ফাতেহা পড়াও জায়েয	৭১
* প্রকাশ্যে ও গোপনে কেরাআত পড়া	৭২
* রাতের নামাযে কেরাআত প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে পড়া	৭৩
* রসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযে যা পড়তেন	৭৪
১. ফজরের নামায	৭৪
* ফজরের সুন্নতের কেরাআত	৭৫
২. যোহরের নামায	৭৬
৩. আসরের নামায	৭৮
৪. মাগরিবের নামায	৭৮
৫. এশার নামায	৭৯
৬. রাতের নামায	৮০
৭. বিতরের নামায	৮৪
৮. জুম'আর নামায	৮৫
৯. দু'ঈদের নামায	৮৫
১০. জানাযার নামায	৮৬
* সুন্দর আওয়াজ ও তারতীল সহকারে কেরাআত পাঠ	৮৬
* ইমামের প্রতি লোকমা দেয়া	৮৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
* শয়তানের ওয়াসওয়াসা দূর করার জন্য নামাযে আউযু বিল্লাহ পড়া ও থুথু নিক্ষেপ করা	৮৮
* রুকু	৮৯
* রুকুর পদ্ধতি	৮৯
* ধীরস্থিরভাবে রুকু করা ওয়াজিব	৯০
* রুকুর যিকর	৯১
* রুকু দীর্ঘায়িত করা	৯৩
* রুকুতে কোরআন পড়া নিষেধ	৯৪
* রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং দো'আ পড়া	৯৪
* রুকু থেকে ধীরস্থিরভাবে দাঁড়ানো ওয়াজিব	৯৭
* সাজদাহ	৯৮
* দু'হাত আগে মাটিতে রেখে সাজদায় যাওয়া	৯৯
* সাজদায় প্রশান্তি লাভ করা	১০২
* সাজদার যিকর	১০২
* সাজদায় কোরআন পড়া নিষিদ্ধ	১০৫
* সাজদাহ দীর্ঘায়িত করা	১০৫
* সাজদার ফযীলত	১০৬
* মাটি ও চাটাইতে সাজদাহ করা	১০৭
* সাজদাহ থেকে উঠা	১০৭
* দু'সাজদার মাঝে দু'পায়ের গোড়ালি দাঁড় করানো	১০৮
* দু'সাজদার মধ্যবর্তী সময় প্রশান্তি ওয়াজিব	১০৯
* দু'সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দোআ ও যিকর	১০৯
* বিশ্রামের বৈঠক	১১০
* পরবর্তী রাকআতের উদ্দেশ্যে উঠার জন্য দু'হাতের উপর ভর দেয়া	১১০
* প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব	১১১
* প্রথম তাশাহ্হুদ	১১১
* তাশাহ্হুদের মধ্যে আঙ্গুল নাড়ানো	১১২
* প্রথম তাশাহ্হুদ ওয়াজিব ও তাতে দোআ পড়া	১১৩
* তাশাহ্হুদের শব্দাবলী	১১৪
১. ইবনে মাসঊদের তাশাহ্হুদ	১১৪
২. ইবনে আব্বাসের তাশাহ্হুদ	১১৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
৩. ইবনে উমরের তাশাহ্হুদ	১১৫
৪. আবু মূসা আশআরীর তাশাহ্হুদ	১১৬
৫. উমার বিন খাত্তাবের তাশাহ্হুদ	১১৬
* রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর দুরূদ পাঠ, দুরূদের স্থান ও শব্দাবলী	১১৬
* তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতের কেয়াম	১২৫
* পাঁচ ওয়াক্ত নামযে দীর্ঘ দো'আ কুনূত বা কুনূতে নাজেলা	১২৬
* বিতরের নামযে কুনূত	১২৭
* শেষ তাশাহ্হুদ	১২৮
* রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর দুরূদ পাঠ করা ওয়াজিব	১২৮
* দোআর আগে ৪টি বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়া ওয়াজিব	১২৯
* সালামের আগে বিভিন্ন প্রকার দোআ	১২৯
* সালাম	১৩৪
* সালাম ফিরানো ওয়াজিব	১৩৫
* নামাযে নারী-পুরুষের পদ্ধতিগত কোনো পার্থক্য নেই	১৩৫
* সমাপ্তি	১৩৬
* দুরূদ	১৩৬
৫. গ্রন্থপঞ্জী	১৩৭

দ্বিতীয় ভাগ

* মুখবন্ধ	১৪৭
* রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামাযের আলোকে প্রচলিত ৭৬টি ভুল সংশোধন	১৫১
* জুমু'আর নামাযের প্রচলিত ৭টি ভুল সংশোধন	২০৩
* অযূ-গোসলের প্রচলিত ১৮টি ভুল সংশোধন	২০৬
* উপসংহার	২১৪

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি নিজ বান্দাহদের ওপর নামায ফরয করেছেন, নামায কায়েম করার ও উত্তমরূপে আদায় করার আদেশ দিয়েছেন, বিনয়কে নামাযের সাফল্যের মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন, নামাযকে ঈমান ও কুফরীর পার্থক্য নির্ণয় করেছেন এবং অশ্লীল ও গুনাহর কাজ থেকে বিরতকারী বানিয়েছেন।

দুরূদ ও সালাম মুহাম্মদ (সঃ)-এর ওপর যাকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"আমরা তোমার প্রতি যিকর (কোরআনের আদেশ-নিষেধ) নাযিল করেছি যেন তুমি লোকদের কাছে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করতে পারো।" (সূরা আন-নাহল ঃ ৪৪)

তিনি এ অর্পিত দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করেছেন। এর মধ্যে নামায হচ্ছে অন্যতম দায়িত্ব, যা তিনি কথা ও কাজের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। এমন কি এ উদ্দেশ্যে একবার তিনি মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়েন ও রুকু-সাজদা করেন এবং বলেন, 'আমি তা এজন্যই করলাম তোমরা যেন তা আমার সঙ্গে আদায় করতে পারো ও আমার নামায দেখে শিখতে পারো।'[১]

তিনি তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণকে আমাদের জন্য কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (بخاري واحمد)

" তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ, সেভাবে নামায আদায় করো।" (বোখারী, আহমদ)

রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর অনুরূপ নামায আদায়কারীদের উদ্দেশ্যে বেহেশতে প্রবেশের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতির সুসংবাদ দেন। তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযূ করে ঠিক ওয়াক্ত মত নামাযগুলো আদায় করে, রুকু ও সাজদা পরিপূর্ণ করে এবং বিনয়

---

১. বোখারী ও মুসলিম।

সহকারে নামায পড়ে, তাকে মাফ করার বিষয়ে আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে। যে ব্যক্তি অনুরূপ করে না, তার জন্য আল্লাহর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে শাস্তি দিতে পারেন।[২]

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বংশধর এবং সাহাবায়ে কেরামের ওপরও সালাম বর্ষিত হোক। যাঁরা আমাদের কাছে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইবাদত, নামায, কথা ও কাজ বর্ণনা করেছেন এবং সেগুলোকেই কেবল মাযহাব ও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাদের ওপরও সালাম ও রহমত বর্ষিত হোক, যারা তাঁদের অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তীতে কেয়ামত পর্যন্ত যারা তাদের অনুসরণ করবেন।

আমি যখন হাফেয আল মোনযেরীর 'আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব' গ্রন্থের নামায অধ্যায় শেষ করি এবং চার বছরব্যাপী কিছু সংখ্যক ভাইকে তা শিক্ষা দেই, তখন আমাদের সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলামে নামাযের স্থান ও মর্যাদা কত বেশী এবং যে ব্যক্তি তা কায়েম করে ও উত্তম রূপে আদায় করে তাতে কত বেশী সওয়াব ও পুরস্কার রয়েছে। অবশ্য রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামাযের সঙ্গে নৈকট্য ও দূরত্বের কারণে সওয়াবেরও বেশ-কম হয়ে থাকে। একথার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েই রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'বান্দাহ নামায পড়ে। কিন্তু সেই নামাযের সওয়াব লেখা হয় এক-দশমাংশ, এক-নবমাংশ, এক-অষ্টমাংশ, এক-সপ্তমাংশ, এক-ষষ্ঠাংশ, এক-পঞ্চমাংশ, এক-চতুর্থাংশ, এক-তৃতীয়াংশ ও অর্ধাংশ।[৩]

সেজন্য আমি বন্ধুদের সতর্ক করে দিয়েছি যে, আমাদের পক্ষে নামায পূর্ণভাবে কিংবা এর কাছাকাছিও আদায় করা সম্ভব নয়, যে পর্যন্ত না আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামাযের বিস্তারিত বর্ণনা জানতে পারবো এবং তাতে কি কি ফরয-ওয়াজির, আদব-কায়দা, নিয়ম-কানুন এবং দো'আ ও যিকর আছে, তা অবগত হতে পারবো। তারপর যদি আমরা সেগুলোকে বাস্তবে পালন করি, তাহলে আশা করা যায় যে, আমাদের নামায আমাদেরকে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আমরা নামাযের জন্য বর্ণিত সওয়াব ও পুরস্কার লাভ করব।

---

২. আবু দাউদ। এটি সহীহ হাদীস। একাধিক ইমাম একে সহীহ বলেছেন।

৩. আবু দাউদ ও নাসাঈ।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, অধিকাংশ লোকের পক্ষে তা বিস্তারিত জানা মুশকিল। এমনকি সুনির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণের কারণে বহু আলেমের পক্ষেও সেগুলো বিস্তারিত জানার অবকাশ নেই। ফিক্‌হ এবং হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের মাধ্যমে হাদীসের প্রতিটি সেবক একথা পরিষ্কার জানেন যে, তাদের প্রত্যেকের মাযহাবে এমন কিছু সুন্নাহ আছে, যা অন্যদের মাযহাবে নেই। সেগুলোর মধ্যেও এমন কিছু সুন্নাহ আছে, যেগুলোকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথা ও কাজ হিসেবে বর্ণনা করা ঠিক নয়।

আবুল হাসানাত লক্ষ্ণৌবী তাঁর 'আন-নাফেউল কবীর লিমান ইউতালেউ জামে' আস-সাগীর' বইতে লিখেছেন, (১২২-১২৩ পৃঃ) বড় বড় ফকীহদের বইগুলোকেও বহু মওযু হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে ফতোয়ার কিতাবগুলোর ক্ষেত্রে একথা বেশী প্রযোজ্য। যদিও লেখকরা বড় পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু তাঁর হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে কিছুটা উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন। ঐ রকম বর্ণিত একটি অসত্য হাদীস হচ্ছে ঃ

مَنْ قَضٰى صَلَوَاتٍ مِّنَ الْفَرَائِضِ فِيْ اٰخِرِ جُمُعَةٍ مِّنْ رَّمَضَانَ كَانَ ذٰلِكَ جَابِرًا لِّكُلِّ صَلَاةٍ فَائِتَةٍ فِيْ عُمُرِهٖ اِلٰى سَبْعِيْنَ سَنَةً-

অর্থ ঃ ''যে ব্যক্তি রমযানের শেষ জুমআর দিন ফরয নামায আদায় করে, এর ফলে তার জীবনের ৭০ বছরের কাযা নামাযের ক্ষতিপূরণ হবে।''

মোল্লা আলী কারী তাঁর 'মাওযুআতুয সোগরা ওয়াল কোবরা' বইতে এটিকে বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা, তা ইজমার পরিপন্থি। ইজমা হচ্ছে, কোন ইবাদত কয়েক বছরের অন্য কোন কাযা ইবাদতের ক্ষতিপূরণ করতে পারে না।

আল্লামা শাওকানী 'আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমুআহ ফিল আহদীসিল মাওযুআহ' গ্রন্থেও এটাকে মাওযু (অসত্য) হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।

তাই হাদীসকে হাদীসের সেবক তথা মোহাদ্দেসীনের কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে।

যাই হোক, পরবর্তীকালে এ প্রবণতা বেশী পরিলক্ষিত হয়। তারা বিনা বিচারে তা রসূলুল্লাহর হাদীস বলে চালিয়ে দেন। সেজন্য ইমাম নববী তাঁর 'আল-মজমু ফী শরহিল মুহায্যাব' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৬০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ মোহেদ্দসীন বলেছেন, হাদীস দুর্বল হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) 'বলেছেন'

'করেছেন,' 'আদেশ দিয়েছেন' এবং 'নিষেধ করেছেন' এ জাতীয় শক্তিশালী ও নিশ্চিত শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা ঠিক নয়। সেসকল ক্ষেত্রে 'বর্ণিত আছে' ও 'উদ্ধৃত আছে' ইত্যাকার দুর্বল ও অনিশ্চিত শব্দ ব্যবহার করার বিধান রয়েছে।

কেননা শক্তিশালী শব্দগুলো বিশুদ্ধ হাদীস এবং দুর্বল শব্দগুলো দুর্বল হাদীসের জন্য ব্যবহার করার নিয়ম রয়েছে।

তাই মোহাদ্দেসীনে কেরাম দুর্বল ও অসত্য হাদীসগুলো থেকে সহীহ হাদীসগুলোকে পৃথক করে ভিন্ন কিতাব রচনা করেছেন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে শেখ আবদুল কাদের বিন মোহাম্মদ আল-কোরাশী আল-হানাফীর রচিত-

اَلْعِنَايَةُ بِمَعْرِفَةِ اَحَادِيْثِ الْهِدَايَةِ এবং اَلطُّرُقُ وَالْوَسَائِلُ فِيْ تَخْرِيْجِ اَحَادِيْثِ خُلَاصَةِ الدَّلَائِلِ-

হাফেয যাইলায়ীর -نَصْبُ الرَّايَةِ لِاَحَادِيْثِ الْهِدَايَةِ

হাফেয ইবনে আসকালানীর اَلدِّرَايَةُ এবং

تَلْخِيْصُ الْخَبِيْرِ فِيْ تَخْرِيْجِ اَحَادِيْثِ الرَّافِعِي الْكَبِيْرِ ইত্যাদি।

বইটি লেখার কারণ

আমি নামাযের ব্যাপারে ব্যাপক ভিত্তিক কোন বই না পাওয়ায় যে ভাইয়েরা নিজেদের ইবাদতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চরিত্রকে অনুসরণ করতে চান, তাদের জন্য নামাযের তাকবীরে তাহরীমা থেকে তাসলীম, অর্থাৎ সালাম ফিরানো পর্যন্ত যথাসম্ভব রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামাযের ব্যাপকভিত্তিক বর্ণনা সম্বলিত একখানা বই লেখার কর্তব্য অনুভব করি। এতে করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঠিক প্রেমিকরা তাঁর এ আদেশ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবেন ঃ

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ اُصَلِّيْ

অর্থ ঃ ''তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ সেভাবে নামায আদায় করো।'' (বোখারী, আহমদ)

তাই আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ থেকে নামায সংক্রান্ত হাদীসগুলো বাছাই করেছি। যার ফলশ্রুতিস্বরূপ এ বই আপনাদের সামনে বিদ্যমান। এ বিষয়ে আমি একটি শর্ত পূরণ করেছি। সেটি হচ্ছে উসূলে

হাদীসের বিধান মোতাবেক যে সকল হাদীসের সহীহ সনদ রয়েছে, আমি কেবলমাত্র সেগুলোকে এ বইতে এনেছি। দুর্বল ও অজ্ঞাত হাদীসগুলোকে যিকর, দোআ ও অন্যান্য অধ্যায়ে পৃথকভাবে বর্ণনা করেছি। আমার মতে, সহীহ হাদীস দ্বারা যে বিষয়টি প্রমাণিত, দুর্বল হাদীস দিয়ে তা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নেই এবং এর কোন ফায়দাও নেই। দুর্বল হাদীস দ্বারা শুধু 'ধারণা' অর্জন করা যায়, নিশ্চিত জ্ঞান নয়। আর 'ধারণা' অগ্রাধিকারযোগ্য নয়। একথাই আল্লাহ কোরআন মাজীদে বলেছেন,

وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (النجم ٢٨)

অর্থ ঃ "ধারণা সত্যের ব্যাপারে কোন কাজে আসে না।"

(সূরা আন নাজম ঃ ২৮)

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

অর্থ ঃ "তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। শুধু ধারণার ভিত্তিতে কথা বলা সবচাইতে বড় মিথ্যা।"[৪]

আল্লাহ আমাদেরকে এর ভিত্তিতে ইবাদত করার নির্দেশ দেননি। বরং রসূলুল্লাহ (সঃ) তা থেকে আমাদেরকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ঃ

اِتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ (الترمذي واحمد)

অর্থ ঃ "তোমরা আমার হাদীস বলা থেকে দূরে থাক। তবে যা তোমরা জান তা ব্যতীত।" তিনি যখন দুর্বল হাদীস বলতে নিষেধ করেছেন, তাহলে এর উপর আমল নিষিদ্ধ হওয়া আরো বেশী যুক্তিসঙ্গত।

আমি এ বইটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছি। উপর ও নীচ। উপরের ভাগে হাদীসের 'মতন'সহ মূল বক্তব্য পেশ করেছি। বিভিন্ন হাদীসের পৃথক পৃথক শব্দগুলোও ফায়দার জন্য উল্লেখ করেছি। আমি সনদে বর্ণনাকারী সাহাবীদের নাম খুব কমই উল্লেখ করেছি। উদ্দেশ্য হল, তা যেন সহজ-পাঠ্য হয়। নীচের অংশে উপরের অংশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি এবং হাদীসের সনদসহ বিভিন্ন সমালোচনা ও পর্যালোচনা করেছি। তাতে দুর্বল ও সহীহ হাদীস সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছি। এরপর আমি উদ্ধৃত হাদীস সম্পর্কে ওলামা ও মোহাদ্দেসীনে কেরামের মতামত উল্লেখ করেছি এবং তাদের

৪. বোখারী ও মুসলিম।